রবীন্দ্রমানসে রামচন্দ্র

কর্ণিকা সেন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় সৃষ্টির যন্ত্রণায় অস্থির বাল্মীকির অশান্ত মনকে তুলনা করেছেন তরুণ গরুড়ের সঙ্গে—যে নিজে জানে না তার ওই মহৎ ক্ষুধা কী করে তৃপ্ত হবে, কোথায় কোন অজানা পৃথিবীতে সে তার নিজের নীড় খুঁজে পাবে। সৃষ্টির আনন্দ যেমন তীব্র, তা প্রকাশ না করতে পারার যন্ত্রণাও তেমন দুঃসহ। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির সেই অসহ্য কষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি নিজেও যে কবি!

''মহর্ষি বাল্মীকি কবি, রক্তবেগতরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত,
তারে লয়ে কী করিবে, ভাবে মুনি
কী তার উদ্দেশ—''

সূর্য যখন অস্ত গেল তখন স্বর্গ থেকে দেবর্ষি নারদ এসে বাল্মীকিকে বললেন : তোমার এই ছন্দ ব্রহ্মলোক থেকে ব্রহ্মা শুনেছেন। তিনি আমাকে বললেন তুমি তমসার তীরে গিয়ে বাল্মীকিকে প্রশ্ন করো, এই ছন্দ নিয়ে সে কোন দেবতার বন্দনা গান করবে।

বাল্মীকি মাথা নেড়ে বললেন : এই ছন্দে আমি কোনও দেবতার বন্দনা গান রচনা করব না, যা স্বর্গ থেকে এসেছে তা আমি স্বর্গকে ফিরিয়ে দেব না। আমার ছন্দে আমি মানুষকে দেবতা করে তুলব।

''কহ মোরে, সর্বদর্শী হে দেবর্ষি,
তাঁর পুণ্য নাম।''
''নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যায় রঘুপতি রাম।' ''

কিন্তু তবু বাল্মীকির সংশয় গেল না। তিনি বললেন : আমি রামচন্দ্রের কিছু কিছু কীর্তির কথা জানি কিন্তু তাঁর জীবনের সব ঘটনা তো জানি না। কী করে তাঁর জীবনী নিয়ে আমি কাব্য রচনা করব?

তখন নারদ হেসে বললেন,

''সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।''

কবির কল্পনা বাস্তবের থেকেও সত্য। কারণ তাঁর অসাধারণ কল্পনা দিয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেন তা বাস্তবের সেইসব ঘটনা থেকে অনেক বেশি বাস্তব।

রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণে দেবতা নিজেকে ছোট করে মানুষ করেননি, মানুষই নিজের গুণে দেবতা হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, রামায়ণের সবচেয়ে বড় গুণ যে এই মহাকাব্যে ঘরের কথাকেই খুব বড় করে দেখানো হয়েছে। মহাকাব্যের

বিষয়বস্তু সাধারণত রাজায় রাজায় যুদ্ধ আর সেই যুদ্ধের যে-করুণ পরিণতি—অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, বিজয়ীর আনন্দ, পরাজিতের আর্তনাদ—এই সবই হয়। কিন্তু রামায়ণ অন্য সব মহাকাব্যের থেকে আলাদা। কারণ তার মহিমা রাম আর রাবণের যুদ্ধকে নিয়ে নয়। সে-যুদ্ধ শুধু রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রেম যে কত উজ্জ্বল তা দেখানোর উপলক্ষ্য। ''পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।''[১] এখানেই রামায়ণের স্বাতন্ত্র্য।

যে-সীতাকে রাম এত ভালবাসতেন সেই সীতাকেও একদিন রাম ত্যাগ করলেন প্রজাদের মন রাখার জন্য। সোনার সীতা গড়িয়ে আনলেন, না হলে যে অশ্বমেধযজ্ঞ পূর্ণ হবে না! রাজার কর্তব্য পালনে রামচন্দ্রের কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু দিনের শেষে ঘরে ফিরে এসে সোনার সীতাকে যখন দেখতেন তখন তাঁর সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণা সম্পর্কে মহাকবি বাল্মীকি সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর চৈতালির 'বনে ও রাজ্যে' কবিতায় সীতার বিরহে রামের দুঃখের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্যভাবে—

''সারাদিন কাটাইয়া সিংহাসন-পরে
সন্ধ্যায় পশিল রাম শয়নের ঘরে।
শয্যার আধেক অংশ শূন্য বহুকাল,
তারি পরে রাখিলেন পরিশ্রান্ত ভাল।
দেবশূন্য দেবালয়ে ভক্তের মতন
বসিলেন ভূমি-পরে সজলনয়ন,
কহিলেন নতজানু কাতর নিশ্বাসে—
'যতদিন দীনহীন ছিনু বনবাসে
নাহি ছিল স্বর্ণমণি মাণিক্যমুকুতা,
তুমি সদা ছিলে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ দেবতা।
আজি আমি রাজ্যেশ্বর, তুমি নাই আর,
আছে স্বর্ণমাণিক্যের প্রতিমা তোমার।'
নিত্যসুখ দীনবেশে বনে গেল ফিরে,
স্বর্ণময়ী চিরব্যথা রাজার মন্দিরে।''

'জাভা-যাত্রীর পত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হতে পেরেছিল। কিন্তু, যখন অযত্নে অনাদরে রামসীতার বিচ্ছেদ ঘটল তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন।'' বনবাসে রাম যে-সুখ পেয়েছিলেন রাজার প্রাসাদে তিনি তা আর পেলেন না।

এমন করে আমরা কি কেউ কখনও রামচন্দ্রের কথা ভেবেছি? একমাত্র রবীন্দ্রনাথই পারেন বাল্মীকির মহাকাব্যের নায়কের এই যন্ত্রণার কথা এত স্বল্প পরিসরে এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে।

সীতার নির্বাসন রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেননি। পঞ্চভূতের 'অপূর্ব রামায়ণ' প্রবন্ধে তাই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন কার জয় হয়—সনাতন ধর্মের না মানুষের প্রেমের।

''রাজা রামচন্দ্র—অর্থাৎ মানুষ—প্রেম-নামক সীতাকে নানা রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়া নিজের অযোধ্যাপুরীতে পরমসুখে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় কতকগুলি ধর্মশাস্ত্র দল বাঁধিয়া এই প্রেমের নামে কলঙ্ক রটনা করিয়া দিল। বলিল, উনি অনিত্য পদার্থের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন, উঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাস্তবিক অনিত্যের ঘরে রুদ্ধ থাকিয়াও এই দেবাংশজাত রাজকুমারীকে যে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে কথা এখন কে প্রমাণ করিবে? এক, অগ্নিপরীক্ষা আছে, সে তো দেখা হইয়াছে—অগ্নিতে ইঁহাকে নষ্ট না করিয়া আরো উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। তবু শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা প্রেমকে মৃত্যু-তমসার তীরে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মহাকবি এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের আশ্রয়ে থাকিয়া এই অনাথিনী, কুশ এবং লব, কাব্য

এবং ললিতকলা-নামক যুগল-সন্তান, প্রসব করিয়াছেন। সেই দুটি শিশুই কবির কাছে রাগিণী শিক্ষা করিয়া রাজসভায় আজ তাহাদের পরিত্যক্তা জননীর যশোগান করিতে আসিয়াছে। এই নবীন গায়কের গানে বিরহী রাজার চিত্ত চঞ্চল এবং তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখনো উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। এখনো দেখিবার আছে— জয় হয় ত্যাগপ্রচারক প্রবীণ বৈরাগ্যধর্মের, না প্রেমমঙ্গল-গায়ক দুটি অমর শিশুর।"

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন রামায়ণ আসলে আর্য ও অনার্যের বিরোধের কাহিনি। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের যবনিকা তুললেই দেখা যাবে প্রথম অঙ্কেই আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের বিরোধ শুরু হয়েছে। কিন্তু অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধে যেসব রাজা জয়ী হয়েছিলেন তাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ কোনও স্থান পাননি।

''কিন্তু অনার্যদের সহিত আর্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।" তিনি রামচন্দ্র। কেন রামচন্দ্র আমাদের প্রিয় তা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন :

''রামায়ণের রাম যে কেবল মহান বলিয়াই আমাদিগকে আনন্দ দিতেছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের সুগোচর, সেও একটা কারণ। রামকে যেটুকু দেখিলে একটি সমগ্ররসে তিনি আমাদের কাছে জাগিয়া উঠেন, সমস্ত বিক্ষিপ্ততা বাদ দিয়া রামায়ণ কেবল সেইটুকুই আমাদের কাছে আনিয়াছে; এইজন্য এত স্পষ্ট তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি, এবং স্পষ্ট দেখিতে পাওয়াই মানুষের একটি বিশেষ আনন্দ। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া মানেই একটা কোনো সমগ্রভাবে দেখিতে পাওয়া, যেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাওয়া।"[২]

রবীন্দ্রনাথের মতে মহাভারতের আর রামায়ণের মূল বিষয় এক— সমাজবিপ্লব। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে বিরোধ মেটানোর জন্য তিনজন ক্ষত্রিয় নেতার বিশেষ ভূমিকা ছিল—জনক, বিশ্বামিত্র আর রামচন্দ্র। দশরথ ছিলেন রক্ষণশীলদের দলে, যাঁরা আর্য ও অনার্যদের মধ্যে মিলনের বিরোধিতা করতেন। জনক ক্ষত্রিয় রাজা হলেও তিনি নিজের হাতে লাঙল নিয়ে চাষ করতেন। একদিকে তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী আর একদিকে তিনি কৃষক। ভক্তির সঙ্গে কর্মের যোগ সেযুগে তিনিই প্রথম করে দেখিয়েছিলেন। তাই তাঁর কন্যার নাম সীতা অর্থাৎ হল চালনা করার রেখা। রবীন্দ্রনাথের মতে :

''এই জনক এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন, আর-এক দিকে স্বহস্তে হলচালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই জানিতে পারি কৃষিবিস্তারের দ্বারা আর্যসভ্যতা বিস্তার করা ক্ষত্রিয়দের একটি ব্রতের মধ্যে ছিল। একদিন পশুপালন আর্যদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল। এই ধেনুই অরণ্যাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত।

বনভূমিতে গোচারণ সহজ; তপোবনে যাহারা শিষ্যরূপে উপনীত হইত গুরুর গোপালনে নিযুক্ত থাকা তাহাদের প্রধান কাজ ছিল।

''অবশেষে একদিন রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশুসম্পদের স্থলে কৃষিসম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। আমেরিকায় য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ যখন অরণ্যের উচ্ছেদ করিয়া কৃষিবিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতেছিলেন তখন যেমন মৃগয়াজীবী আরণ্যকগণ পদে পদে তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছিল—ভারতবর্ষেও সেরূপ আরণ্যকদের সহিত কৃষকদের বিরোধে কৃষিব্যাপার কেবলই বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা অরণ্যের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে যাইবেন তাঁহাদের কাজ সহজ ছিল না। জনক মিথিলার রাজা ছিলেন—ইহা হইতে জানা যায় আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত আর্য উপনিবেশ আপনার সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল।''[৩]

জনক ও রামচন্দ্রের মধ্যে আত্মীয়তার সূত্র গ্রথনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন বিশ্বামিত্র। রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অনার্য পরাভব ব্রতে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি দশরথের কাছ থেকে একরকম জোর করে রামকে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমেই রামচন্দ্রকে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বশ করতে হয়েছিল। এই রাক্ষসরা কারা? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন আর্যরা ভারতবর্ষে আসার আগে দ্রাবিড়রা এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তারা ভারতবর্ষের যারা ভূমিপুত্র অর্থাৎ আদিম অধিবাসী তাদের উচ্ছেদ করেছিল। তারাই রামায়ণের রাক্ষস।

''আর্যদের ভারত-অধিকারের পূর্বে যে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিম নিবাসীদিগকে জয় করিয়া এই দেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। তাহারা আর্যদের কাছে সহজে হার মানে নাই। ইহারা আর্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত, চাষের ব্যাঘাত করিত, কুলপতিরা অরণ্য কাটিয়া যে এক-একটি আশ্রম স্থাপন করিতেন সেই আশ্রমে তাহারা কেবলই উৎপাত করিত।''[৪]

রাক্ষসদের বিরুদ্ধে জয় সহজে আসেনি। অনেকদিন ধরে রামকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। বিশ্বামিত্র তাঁকে খুব ভাল করে যাচাই করে তবেই তাঁকে অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্যপাত্র বলে স্থির করেছিলেন।

অনার্যদের দেবতা শিব। কে হরধনু ভাঙতে পারবে তাই নিয়ে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। রাবণও হরধনুভঙ্গ করতে পারেননি। ''বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনু-ভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালনরেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন।''[৫]

'জাভা-যাত্রীর পত্র'-তে এ-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ''হরধনুভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনুভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে-অভিযান হয়েছিল সে সহজ হয় নি; তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।''

সীতাকে নিয়ে মিথিলা থেকে ফেরার সময়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে ক্ষত্রিয়বিদ্বেষী পরশুরামের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে রামচন্দ্রের জয় হয়েছিল।

''এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণবীরকে বধ না করিয়া তিনি তাঁহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান করা যায়, ঐক্যসাধনব্রত গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাহার

প্রথম পর্বেই কতক বীর্যবলে, কতক ক্ষমাগুণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন। রামের জীবনের সকল কার্যেই এই উদার বীর্যবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।"[৬]

এই তিনটি বিশেষণের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রের চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন, দক্ষ চিত্রকরের নিপুণ হাতের ছবির মতো। রাম বীর কিন্তু তিনি উদার। শত্রুর অপরাধ তিনি সস্নেহে ক্ষমা করেন। আবার অনুর্বর ভূমিকে তিনি উর্বর করেন।

''বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব রাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে ভূমি হলচালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন; তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।"[৭]

এর পরের পর্ব রামের বনবাস। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরস্কার কবিতায় বনবাস যাত্রার দিনটি উল্লেখ করে লিখেছেন,

''কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে
সেই একদিন কেটেছে কেমনে
যেদিন মলিন বাকলবসনে
চলিলা বনের পথে—
ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লানছায়াসম বিষাদবিলীন
নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায়রথে।
রাজপুরী-মাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে-সার,
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে!
অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারি ধার—
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।"

সেই একদিন—যেদিন কোথা থেকে যেন একটা ঝড় এসে উৎসবের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সত্যিই কি ঝড় উঠেছিল না রামচন্দ্র নিজেই বনে যেতে চেয়েছিলেন—এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনেও সংশয় ছিল। কৈকেয়ী দশরথকে বাধ্য করেছিলেন রামকে বনে পাঠাতে—এসব হয়তো কবির কল্পনা। রাম নিজেই আর্য ও অনার্যদের বিরোধ দূর করার জন্য বনে যেতে চেয়েছিলেন।

''রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিকিতে পারে নাই। পরবর্তীকালে এই কাব্য যখন জাতীয়সমাজে বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতিকে কোনো এক রাজবংশের পারিবারিক ঘরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনই দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত স্ত্রৈণতাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া ঘটাইয়াছে।"[৮]

অযোধ্যায় সেই যুগে আর্যদের মধ্যে দুটি দল ছিল। একদল অনার্যদের সঙ্গে মিলনের প্রবল বিরোধী ছিলেন। আর এক দল ছিলেন প্রগতিশীল, তাঁরা আর্য ও অনার্য বিরোধ দূর করে আর্যদের উপনিবেশ ভারতবর্ষের দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। রামচন্দ্র এই নতুনদের দলে ছিলেন। ''অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেকে বাধা পড়িয়া

রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবত তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রবল—এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এইজন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীর পুত্রকেও তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই নির্বাসনে রামের বীরত্বের সহায় হইলেন লক্ষ্মণ ও তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী হইলেন সীতা অর্থাৎ তাঁহার সেই ব্রত। এই সীতাকেই তিনি নানা বাধা ও নানা শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া বন হইতে বনান্তরে ঋষিদের আশ্রম ও রাক্ষসদের আবাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।”[৯]

কে ছিলেন সীতা? কোনও সামান্য রাজকুমারী নন। ইনি আর্যদের কৃষিবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এককালে জনক রাজা ছিলেন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রতিনিধি। তিনি এই সভ্যতার অন্নময় ও জ্ঞানময় দুটি ধারাকে নিজের মধ্যে মিলিয়েছিলেন। কৃষি ও ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ আর্থিক ও পারমার্থিক—এই দুয়ের মধ্যেই ঐক্যসাধনার দুই পথ। সীতা তো জনকের শরীরিণী কন্যা ছিলেন না, মহাভারতের দ্রৌপদী যেমন যজ্ঞসম্ভবা সীতাও তেমনই কৃষিসম্ভবা। হলবিদারণ-রেখায় জনক তাঁকে পেয়েছিলেন। এই সীতাই, এই কৃষিবিদ্যাই, আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে রাক্ষসদমন বীরের সঙ্গিনী হয়ে সে-সময়কার সভ্যতার ঐক্যবন্ধনে আর্য-অনার্য সকলকে বেঁধে উত্তরে দক্ষিণে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তবে রামায়ণ শুধু আর্য ও অনার্যদের বিরোধের কাহিনি নয়। রামচন্দ্র শুধু মহাবীর নন, তিনি একজন আদর্শ মানুষ।

বনবাসে সীতাকে হারিয়ে রামচন্দ্র যে কত কষ্ট পেয়েছিলেন তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন তাঁর ‘পুরস্কার’ কবিতায় :

‘‘আর-একদিন, ভেবে দেখো মনে,
যেদিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটিরভবনে
দেখিলা জানকী নাহি—
‘জানকী’, ‘জানকী’ আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা-অরণ্য আঁধার আননে
রহিল নীরবে চাহি।”

সীতাকে হারানোর পরে রামচন্দ্র যখন ব্যাকুল হয়ে বনের মধ্যে লক্ষ্মণকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন বানরদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এই বানররা আসলে কারা? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এরা আসলে অনার্যদের একটি শাখা যারা বানরকে দেবতা বলে পুজো করত।

‘‘নৃতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্বর জাতির অনেকেরই মধ্যে এক-একটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপে নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় রামচন্দ্র যে অনার্যদলকে বশ করিয়াছিলেন তাহারাও যে এইরূপ কারণেই বানর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল তো বানর নহে রামচন্দ্রের দলে ভল্লুকও ছিল। বানর যদি অবজ্ঞাসূচক আখ্যা হইত তবে ভল্লুকের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।”[১০]

কী করে রাম বশ করলেন বানরদের? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বাহুবলে বা জোর করে নয়, ভালবাসা দিয়েই তিনি তাদের বশ করেছিলেন; তাদের ভক্তি লাভ করেছিলেন। ‘‘রামচন্দ্র এই যে বানরদিগকে বশ করিয়াছিলেন তাহা রাজনীতির দ্বারা নহে, ভক্তিধর্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হনুমানের ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।”[১১] এ-প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, ''দাক্ষিণাত্যে কোনো দুর্গম স্থানে এই দ্রাবিড়জাতীয় রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদেরই প্রেরিত দলবল হঠাৎ বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর্য-উপনিবেশগুলিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

''রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহু দিনের চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন; এই কারণেই তাঁহার গৌরবগান আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।''[১২]

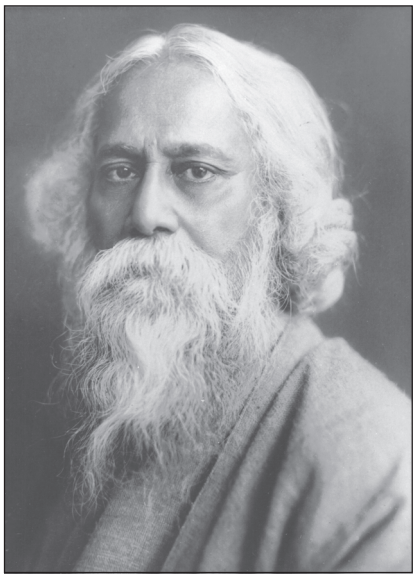

জাভাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন সেখানকার মানুষ হনুমানকে কত শ্রদ্ধা করে। তা দেখে তাঁর ভাল লেগেছিল। সেখানে তিনি একটি নাচ দেখেছিলেন—হনুমান ও ইন্দ্রজিতের লড়াই। ''সাধারণত আমাদের যাত্রায় নাটকে হনুমানের হনুমানত্ব খুব বেশি করে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের কৌতুক উদ্রেক করবার চেষ্টা করা হয়। এখানে হনুমানের আভাসটুকু দেওয়াতে তার মনুষ্যত্ব আরো বেশি উজ্জ্বল হয়েছে। হনুমানের নাচে লম্ফ-ঝম্ফ দ্বারা তার বানরস্বভাব প্রকাশ করা কিছুই কঠিন হত না, আর সেই উপায়ে সমস্ত সভা অনায়াসেই অট্টহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠত, কিন্তু কঠিন কাজ হচ্ছে হনুমানকে মহত্ত্ব দেওয়া। বাংলাদেশের অভিনয় প্রভৃতি দেখলে বোঝা যায় যে, হনুমানের বীরত্ব, তার একনিষ্ঠ ভক্তি ও আত্মত্যাগের চেয়ে—তার লেজের দৈর্ঘ্য, তার তার পোড়ামুখের ভঙ্গিমা, বানরত্বই বাঙালির মনকে বেশি করে অধিকার করেছে। আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে তার উলটো। এমন-কি হনুমানপ্রসাদ নাম রাখতে বাপমায়ের দ্বিধা বোধ হয় না। বাংলায় হনুমানচন্দ্র বা হনুমানেন্দ্র আমরা কল্পনা করতে পারি নে। এ দেশের লোকেরাও রামায়ণের হনুমানের বড়ো দিকটাই দেখে। নাচে হনুমানের রূপ দেখলুম—পিঠ বেয়ে মাথা পর্যন্ত লেজ, কিন্তু এমন একটা শোভনভঙ্গি যে দেখে হাসি পাবার জো নেই। আর-সমস্তই মানুষের মতো।''[১৩]

শুধু রামচন্দ্রকে নয়, তাঁর ভক্ত হনুমানকেও রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধা করতেন তার প্রমাণ আমরা তাঁর এই 'জাভা-যাত্রীর পত্র'-তে পাই। এখানে প্রথম পাতাতে আমরা রামচন্দ্রকেও পাই।

''কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত যতদূর গেলুম রেলগাড়ির জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে মনে হল, পৃথিবীতে সবুজের বান ডেকেছে; শ্যামলের বাঁশিতে তানের পর তান লাগছে, তার আর বিরাম নেই। খেতে খেতে নতুন ধানের অঙ্কুরে কাঁচা রং, বনে বনে রসপরিপুষ্ট প্রচুর পল্লবের ঘন সবুজ। ধরণীর বুকের থেকে অহল্যা জেগে উঠেছেন; নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শ লাগল।''

আর্য-অনার্য মিলন ঘটানোর ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের বনবাস পর্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই পর্বেই রামচন্দ্র নিজে ক্ষত্রিয় হয়েও অগ্নিসাক্ষী করে বন্ধুত্ব করেছিলেন এক চণ্ডালের সঙ্গে। চণ্ডাল গুহকই তাঁর জীবনের প্রথম বন্ধু। তাঁর শত্রুর ভাই বিভীষণকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাকে বুকে

টেনে নিয়েছিলেন। এমনকী তাঁর সেতুবন্ধন করার সময় তিনি সামান্য কাঠবেড়ালিকেও উপেক্ষা করেননি, তারও সাহায্য নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালান্তরের 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধে পৃথিবীর ইতিহাসে কোন জাতের মানুষ নিজের চিহ্ন রেখে যেতে পারবে সেই প্রসঙ্গে রামায়ণের কাঠবেড়ালির কথা বলেছেন।

''রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন কাঠবেড়ালিরও স্থান হয়েছিল সেই কাজে। সে তখন শুধু গাছের কোটরে নিজের খাদ্যান্বেষণে না থেকে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই দুই তটভূমির বিচ্ছেদসমুদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে যোগ দিয়েছিল। সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করাই পৃথিবীতে সকল মহৎ সাধনার রূপক। সেই সীতাই ধর্ম; সেই সীতাই জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি; সেই সীতা সুন্দরী; সেই সীতা সর্বমানবের কল্যাণী। নিজের কোটরের মধ্যে প্রভূত খাদ্যসঞ্চয়ের ঐশ্বর্য নিয়ে এই কাঠবেড়ালির সার্থকতা ছিল না, কিন্তু সীতা-উদ্ধারের মহৎ কাজে সে যে নিজেকে নিবেদন করেছিল এইজন্যেই মানবদেবতা তার পিঠে আশীর্বাদরেখা চিহ্নিত করেছিলেন।''

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে যে-ব্রতে দীক্ষিত করেছিলেন, পরবর্তী কালে ছোটভাই ভরতের উপর রাজ্যভার দিয়ে রামচন্দ্র সেই মহৎ প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য বনে গমন করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে সেকথাই উল্লেখ করেছেন।

''ভরদ্বাজ, অগস্ত্য প্রভৃতি যে-সকল ঋষি দুর্গম দক্ষিণে আর্যনিবাস-বিস্তারে প্রবৃত্ত ছিলেন তাঁহাদের উপদেশ লইয়া অনুচর লক্ষ্মণের সঙ্গে অপরিচিত গহন অরণ্যের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

''সেখানে বালি ও সুগ্রীব-নামক দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইয়ের মধ্যে এক ভাইকে মারিয়া অন্য ভাইকে দলে লইলেন। বানরদিগকে বশ করিলেন, তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া সৈন্য গড়িলেন। সেই সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের মধ্যে কৌশলে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দিলেন। এই রাক্ষসেরা স্থাপত্যবিদ্যায় সুদক্ষ ছিল। যুধিষ্ঠির যে আশ্চর্য প্রাসাদ তৈরি করিয়াছিলেন ময়দানব তাহার কারিকর। মন্দির নির্মাণে দ্রাবিড়জাতীয়ের কৌশল আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। ইহারাই প্রাচীন ইজিপ্‌টীয়দের স্বজাতি বলিয়া যে কেহ কেহ অনুমান করেন তাহা নিতান্ত অসংগত বোধ হয় না।

''যাহা হউক, স্বর্ণলঙ্কাপুরীর যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছিল তাহার একটা কিছু মূল ছিল; এই রাক্ষসেরা অসভ্য ছিল না। বরঞ্চ শিল্পবিলাসে তাহারা আর্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।''

রামচন্দ্র শত্রুদের পরাজিত করে যে-উদারতা দেখিয়েছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি অনার্যদের রাজ্যে আর্য উপনিবেশ স্থাপন করেননি। কারণ তিনি ভাল করেই জানতেন তা কোনওদিন স্থায়ী হবে না। রামচন্দ্রের এই দূরদর্শিতার বারবার প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ''রামচন্দ্র শত্রুদিগকে বশ করিয়াছিলেন, তাহাদের রাজ্য হরণ করেন নাই। বিভীষণ তাঁহার বন্ধু হইয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিতে লাগিল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যভার বানরদের হাতে দিয়াই চিরদিনের মতো তিনি তাহাদিগকে বশ করিয়া লইলেন। এইরূপে রামচন্দ্রই আর্যদের সহিত অনার্যদের মিলন ঘটাইয়া পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাহারই ফলে দ্রাবিড়গণ ক্রমে আর্যদের সঙ্গে একসমাজভুক্ত হইয়া হিন্দুজাতি রচনা করিল। এই হিন্দুজাতির মধ্যে উভয়জাতির আচারবিচার-পূজাপদ্ধতি মিশিয়া গিয়া ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হয়।''[১৪]

রামায়ণের কবি কিন্তু রামচন্দ্রের এই সমাজ সংস্কারকের ভূমিকাকে বেশি গুরুত্ব দেননি। তিনি রামচন্দ্রকে শুধু একজন মহৎচরিত্র আদর্শ

মানুষ হিসেবেই রামায়ণে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''যে কবি দেশপ্রচলিত চরিতগাথাগুলিকে মহাকাব্যের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিলেন তিনি এই অনার্যবশ ব্যাপারকেই প্রাধান্য না দিয়া মহৎ চরিত্রের এক সম্পূর্ণ আদর্শকে বড়ো করিয়া তুলিলেন। তিনি করিয়া তুলিলেন বলিলে বোধ হয় ভুল হয়। রামচন্দ্রের পূজ্যস্মৃতি ক্রমে ক্রমে কালান্তর ও অবস্থান্তরের অনুসরণ করিয়া আপনার পূজনীয়তাকে সাধারণে ভক্তিবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। কবি তাঁহার প্রতিভার দ্বারা তাহাকে এক জায়গায় ঘনীভূত ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। তখন সর্বসাধারণের ভক্তি চরিতার্থ হইল।''[১৫]

এই ভক্তিই দস্যু রত্নাকরকে মহাকবি বাল্মীকি করে তুলেছিল। ''দস্যুকে কবি করিয়া তুলিয়াছে রামের এমন চরিত্র—ভক্তির এমন প্রবলতা। রামায়ণের রাম যে ভারতবর্ষের চক্ষে কতবড়ো হইয়া দেখা দিয়াছেন এই গল্পে যেন তাহা মাপিয়া দিতেছে।''[১৬]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ক্রৌঞ্চ মিথুনের গল্পই রামায়ণের গল্পের প্রতিধ্বনি। ব্যাধ যেমন প্রেমিককে প্রেমিকার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, রাবণও সেই নিষ্ঠুর ব্যাধের মতো সীতাকে হরণ করেছিল। আবার আর এক দিক থেকে দেখতে গেলে রাবণ ব্যাধের চেয়েও নিষ্ঠুর। ''ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকার্ত ক্রন্দন রামায়ণকথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মতো প্রেমিকযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধব্যাপার উন্মত্ত বিরহীর পাখার ঝট্‌পটি। রাবণ যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল মৃত্যুবিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক।...

''সুখের আয়োজনটি কেমন সুন্দর হইয়া আসিয়াছিল। পিতার স্নেহ, প্রজাদের প্রীতি, ভ্রাতার প্রণয়, তাহারই মাঝখানে ছিল নব পরিণীত রামসীতার যুগলমিলন। যৌবরাজ্যের অভিষেক এই সুখসম্ভোগকে সম্পূর্ণ এবং মহীয়ান করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠিক এমন সময়েই ব্যাধ শর লক্ষ করিল, সেই শর বিদ্ধ হইল সীতাহরণকালে। তাহার পরে শেষ পর্যন্ত বিরহের আর অন্ত রহিল না। দাম্পত্যসুখের নিবিড়তম আরম্ভের সময়েই দাম্পত্যসুখের দারুণতম অবসান।''[১৭]

তার পরিণতিতে সীতার পাতালপ্রবেশ। রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতায় দেখি—

''তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,
ভেবে দেখো কথা সেই দিবসের—
এত বিষাদের এত বিরহের
এত সাধনার ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভা-মাঝে
বিদায়বিনয়ে নমি রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।''

অনেক সমালোচক মনে করেন রামায়ণের উত্তরকাণ্ড পরবর্তী যুগের কোনও কবির রচনা। কারণ যে-রামচন্দ্র একদিন সমাজের সমস্ত প্রথাকে ভেঙে গুহক চণ্ডালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন সেই রামচন্দ্রকেই আমরা দেখি উত্তরকাণ্ডে একজন শূদ্রকে শুধু তপস্যা করার জন্য প্রাণদণ্ড দিতে। যে-সীতার জন্য তিনি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, যে-সীতার জন্য তিনি একদিন পাগলের মতো কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেরিয়েছেন, তাঁকেও তিনি প্রজারঞ্জন করার জন্য নির্বাসন দিলেন। রবীন্দ্রনাথও সমালোচকদের সঙ্গে একমত তবে তিনি রামচন্দ্রের এই পরিবর্তনের এক যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন :

''ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিতের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত

করিতে চাহিয়াছে; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনী সৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শ চরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচার-রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল। রামচরিতের মধ্যে যে একটি সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অনুগত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিতকে গৃহধর্মের ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মতো বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক। ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই, এককালে যে রামচন্দ্র ধর্মনীতি ও কৃষিবিদ্যাকে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁহারই চরিতকে সমাজ পুরাতন বিধিবন্ধনের অনুকূল করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষে বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন আর-একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে। বস্তুত রামচন্দ্রের জীবনের কার্যে এই গতিস্থিতির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।”[১৮]

রামচন্দ্রের চরিত্র সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তাঁর বালিবধকে আমরা সমর্থন করতে পারি না, যেমন পারি না সীতার অগ্নিপরীক্ষা নেওয়াকে। আবার অনেকসময় তিনি কিছু অপ্রিয় কথা বলেছেন যাঁরা তাঁর খুব কাছের মানুষ তাদেরও। রবীন্দ্রনাথের মতে রামচন্দ্রের চরিত্রের এই ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মানুষ কখনও সুখেদুঃখে একেবারে অবিচলিত থাকতে পারে না। রামায়ণের কবি রামচন্দ্রকে একজন মানুষ বলেই দেখাতে চেয়েছিলেন। আর মানুষ জীবনের পথে চলার সময় মাঝেমাঝে ভুল করে। কিছু ভুল করেছিলেন বলেই না আমরা রামচন্দ্রকে আমাদের খুব কাছের মানুষ বলে ভাবতে পারি। নাহলে তিনি তো আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে একজন দেবতা হয়েই থাকতেন। ‘সাহিত্যের মাত্রা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছেন, তবে তিনি একইসঙ্গে উত্তরকাণ্ডের তীব্র সমালোচনাও করেছেন। ‘যুদ্ধকাণ্ড’ পর্যন্ত রামায়ণে রামের যে-দেখা পাওয়া গেছে সেটাতে চরিত্রই প্রকাশিত। তার মধ্যে ভাল দিক আছে, মন্দ দিকও আছে। আত্মখণ্ডন আছে। দুর্বলতা যথেষ্ট আছে। রাম যদিও প্রধান নায়ক তবু শ্রেষ্ঠতার কোনও কাল-প্রচলিত বাঁধা নিয়মে তাঁকে স্বাভাবিকরূপে সুসংগত করে সাজানো হয়নি অর্থাৎ কোনও-একটা শাস্ত্রীয় মতের নিখুঁত প্রমাণ দেওয়ার কাজে তিনি পাঠক-আদালতে সাক্ষী রূপে দাঁড়াননি। পিতৃসত্য রক্ষা করার উৎসাহে পিতার প্রাণনাশ যদি বা শাস্ত্রবুদ্ধি থেকে ঘটে থাকে, বালিবধ না শাস্ত্রীয় না ধর্মনৈতিক। তাছাড়া বিশেষ উপলক্ষ্যে রামচন্দ্র সীতা সম্বন্ধে লক্ষ্মণের উপরে যে-বক্রোক্তি প্রয়োগ করেছিলেন তাতেও শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বজায় থাকেনি। বাঙালি সমালোচক যেরকম আদর্শের ষোলো-আনা উৎকর্ষ যাচাই করে সাহিত্যে চরিত্রের

সত্যতা বিচার করে থাকেন সে-আদর্শ এখানে খাটে না। রামায়ণের কবি কোনও-একটা মতসংগতির লজিক দিয়ে রামের চরিত্র বানাননি, অর্থাৎ সে-চরিত্র স্বভাবের, সে-চরিত্র সাহিত্যের, সে চরিত্র ওকালতির নয়।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, উত্তরকাণ্ডে সাহিত্যসৃজন অপেক্ষা সামাজিক প্রেক্ষাপট বড় হয়ে উঠল আর সে-কারণে রাবণের গৃহে বন্দিনী সীতার বনবাস এবং অগ্নিপরীক্ষার মতো বিষয়ের সংযোজন প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েছে। সেই বাহবার জোরেই ওই জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনও মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।

তবে উত্তরকাণ্ড না থাকলে রামায়ণ অবিচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনি হয়ে উঠতে পারত না। একবার সীতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছিল দৈবদুর্বিপাকে। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে রাম স্বেচ্ছায় সীতা-বিরহের দুঃখকে বরণ করে নিলেন। আর এই দুঃখের জন্যই রামায়ণ ভারতবর্ষের মানুষের কাছে এত প্রিয়। রামচন্দ্র আমাদের রাজা আর সীতা আমাদের রানি। রবীন্দ্রনাথও সেই একই কথা বলেছেন তাঁর পঞ্চভূতের কাব্যের তাৎপর্য প্রবন্ধে,

''রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও, সর্বপ্রকার সুখের সম্ভাবনাসত্ত্বেও, আমৃত্যুকাল অসীম দুঃখ রাম ও সীতাকে সংকট হইতে সংকটান্তরে ব্যাধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে; সংসারের এই অত্যন্ত সম্ভবপর, মানবাদৃষ্টের এই অত্যন্ত পুরাতন দুঃখকাহিনীতেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট এবং আর্দ্র হইয়াছে।''

একই কথার প্রতিধ্বনি আমরা পাই তাঁর 'দুঃখ' প্রবন্ধেও। ''রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্তি দেখিয়াছে দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব, যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।''

বীরত্ব কাকে বলে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''বৃহৎ ভাবের নিকটে আত্ম বিসর্জন করাকে যদি পাগলামি বলে, তবে সেই পাগলামি এক কালে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ছিল। ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। কর্তব্যের অনুরোধে রাম যে রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলেন তাহাই বীরত্ব, এবং সীতা ও লক্ষ্মণ যে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন তাহাও বীরত্ব। ভরত যে রামকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন তাহা বীরত্ব, এবং হনুমান যে প্রাণপণে রামের সেবা করিয়াছিলেন তাহাও বীরত্ব। হিংসা অপেক্ষা ক্ষমায় যে অধিক বীরত্ব, গ্রহণের অপেক্ষা ত্যাগে অধিক বীরত্ব, এই কথাই আমাদের কাব্যে ও শাস্ত্রে বলিতেছে। পালোয়ানিকে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বড়ো জ্ঞান করিত না। এইজন্য বাল্মীকির রাম রাবণকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রাবণকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাম বাবণকে দুইবার জয় করিয়াছেন। একবার বাণ মারিয়া, একবার ক্ষমা করিয়া। কবি বলেন, তন্মধ্যে শেষের জয়ই শ্রেষ্ঠ।''[১৯]

বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র আদর্শ রাজা কিন্তু কৃত্তিবাসের রাম শুধু কর্তব্যপরায়ণ রাজা নন, তিনি ভক্তবৎসল। ''কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক-চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে

বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।"[২০]

রবীন্দ্রমানসে রামচন্দ্র কোনও কবির কাল্পনিক চরিত্র নন। তিনি একজন আদর্শ মানুষ যিনি তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি দিয়ে আর্য ও অনার্যের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ দূর করে ভারতবর্ষে আর্যসভ্যতার ভিত সুদৃঢ় করেছিলেন। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকে দেবতা বলে পুজো করতে শুরু করে। তিনি জনক রাজার যোগ্য উত্তরসূরি। রামচন্দ্রই আর্যাবতের সভ্যতা যা মূলত কৃষিকেন্দ্রিক ছিল তাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার করেছিলেন। তাই 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' প্রবন্ধে অর্থলোভী ধনী মহাজনেদের হাতে গরিব চাষীদের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এই চাষীদের সেই রামচন্দ্রকে চাই যিনি বনের বানরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে প্রচণ্ড প্রতাপশালী দশাননকে পরাজিত করেছিলেন : ''লঙ্কার বহুখাদ্যখাদক দশমুণ্ডধারী বহু-অর্থ-গৃধ্নু দশ-হাতওয়ালা রাবণকে মেরেছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরের সংঘবদ্ধ শক্তি। একটি প্রেমের আকর্ষণে সেই সংঘটি বেঁধেছিল। আমরা যাঁকে রামচন্দ্র বলি তিনিই প্রেমের দ্বারা দুর্বলকে এক করে তাদের ভিতর প্রচণ্ড শক্তিবিকাশ করেছিলেন। আজ আমাদের উদ্ধারের জন্যে সেই প্রেমকে চাই, সেই মিলনকে চাই।"

সেই রামচন্দ্রকে আমরাও চাই। এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তাঁর জন্য যিনি আবার ভারতবর্ষে সব শ্রেণির, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দেবেন। তিনি কারওকে দরিদ্র, হীন বা তুচ্ছ বলে মনে করতেন না : ''...নিতান্ত তুচ্ছ লোকের ক্ষুদ্র কাজের পিছনে রাম লক্ষ্মণ আসিয়া দাঁড়াইতেছেন, অন্ধকার বাসার মধ্যে পঞ্চবটীর করুণামিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে...।"[২১]

সেই রামচন্দ্রকে আজ আমাদের চাই। ✠

তথ্যসূত্র

১। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (বিশ্বভারতী : কলকাতা, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), *প্রাচীনসাহিত্য (রামায়ণ)*, খণ্ড ৩ (১৩৯৩), পৃঃ ৭১৩

২। তদেব, *সাহিত্য (সৌন্দর্য ও সাহিত্য)*, খণ্ড ৪ (১৩৯৪), পৃঃ ৬৫৪-৫৫

৩। তদেব, *পরিচয়* (*ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা*) খণ্ড ৯ (১৩৯৬), পৃঃ ৫৮০

৪। তদেব, *সাহিত্য* (*সাহিত্যসৃষ্টি*), খণ্ড ৪ (১৩৯৪), পৃঃ ৬৬১

৫। তদেব, *পরিচয় (ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা)*, খণ্ড ৯, পৃঃ ৫৮০

৬। তদেব, পৃঃ ৫৭৯

৭। তদেব, পৃঃ ৫৮০

৮। তদেব, পৃঃ ৫৭৯

৯। তদেব, পৃঃ ৫৮১

১০। তদেব পৃঃ ৫৮২

১১। তদেব

১২। তদেব, *সাহিত্য* (*সাহিত্যসৃষ্টি*), খণ্ড ৪, পৃঃ ৬৬১

১৩। *জাভা-যাত্রীর পত্র*, খণ্ড ১০ (১৩৯৬), পৃঃ ৫৩৬

১৪। *সাহিত্য* (*সাহিত্যসৃষ্টি*), খণ্ড ৪, পৃঃ ৬৬২

১৫। তদেব

১৬। তদেব *(কবিজীবনী)*, পৃঃ ৬৮৯

১৭। তদেব

১৮। তদেব, *পরিচয়* (*ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা*), খণ্ড ৯, পৃঃ ৫৮১-৮২

১৯। তদেব, *(চিঠিপত্র)*, খণ্ড ১, পৃঃ ৮৭১

২০। তদেব, *সাহিত্য (সাহিত্যসৃষ্টি)*, খণ্ড ৪, পৃঃ ৬৬৩

২১। তদেব, *সাহিত্য (বিশ্বসাহিত্য)*, পৃঃ ৬৪৮